আজকের কাগজ
তারিখ 12 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

গুরু মারার কর্মসূচী প্রসঙ্গে

হরিপদ ভট্টাচার্য

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ব্যঙ্গ কৌতুক এরকমঃ একবার এক লোক এক টাকা দিয়ে বিশটি বিড়াল কেনে এবং এ বিশটি বিড়াল আবার এক টাকায় বেচে দেয়। ঘটনাটি অন্য এক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে। কৌতূহলবশত দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বিড়াল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানতে চান উক্ত বিড়াল কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে তার লাভ কি হলো- উত্তরে বিড়াল ব্যবসায়ী বললো কেন, আঁচড় আর খামছা। কৌতুক কৌতুকই। বাস্তবে এর কোন মিল না থাকলেও মাঝে-মধ্যে সমাজজীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার সাথে এমনি কোন কৌতুকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তেমনি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ৪০ দিনের কর্মবিরতি। গত ২৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে শিক্ষকরা এই কর্মবিরতি পালন করেন। শিক্ষক সমিতি তার সাধারণ সভায় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যতদিন পর্যন্ত ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস দমন না করা হবে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করবেন। কিছুদিন পর সমিতি আবার নতুন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- কর্মবিরতির মধ্যে কেবলমাত্র ক্লাস বর্জন আওতাভুক্ত। কারণ, ইতিমধ্যে আটবার তারিখ পেছানো অনার্স এবং মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ আসন্ন হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার্থীদের অসহায়ত্ব বিবেচনা করে সমিতি পরীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব কর্ম বিরতি থেকে বাদ দেয়। শিক্ষক সমিতি ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আরাম-আয়াসে নিজেদের জীবন কাটানোর জন্য নয়; বরং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো কি? ছাত্ররা ঘোষণা দিয়ে দিলো কর্মবিরতি না ভাঙলে মাসের পয়লা তারিখ সোনালী ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অবরোধ করা হবে। কারণ, মাসের এক তারিখ শিক্ষকরা উক্ত ব্যাংক থেকে তাঁদের মাইনে তোলেন। বেতন তুলতে না দেওয়া হলে তারা না খেয়ে মারা যাবে, ফলে বাধ্য হয়ে সমিতি কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবে। এই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আগামী দিনের শিক্ষকদের আদর্শ এবং জাতির বিবেকদের দেশ গড়ার পরিকল্পনার নমুনা! শিক্ষকদের উক্ত সন্ত্রাসবিরোধী কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন সমালোচনার ঝড়ও বয়ে গেছে, এমনকি সমিতির সদস্য হয়েও কিছুসংখ্যক শিক্ষক কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন পত্র-পত্রিকায়। অবশেষে 'আঁচর আর খামছা' খেয়ে সমিতি বাধ্য হলো কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে। যে উদ্দেশ্যে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেই সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলতে গেলে প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যথারীতি সংঘটিত হচ্ছে। এতদিন ছাত্র-শিক্ষক অনেকেই কর্মবিরতির যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, অপরদিকে প্রত্যাহারের পর সকলেই আলোচনা করছেন কবে আবার মারামারি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় 'সাইনে ডাই' হবে। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী, যাদের অনার্স কিংবা মাস্টারস পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে শিক্ষকদের কর্মবিরতির সুবাদে (না, কুবাদে), তাদের অনেকেই দোয়া করে মাস্টারদের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আয়ু বাড়লেই বরং বিপদ। তাছাড়া ইতিহাস হয়ে থাকবে, বা বিভিন্ন সময়ে ফলাও করে পত্রিকায় ছাপানো হবে "শিক্ষকদের ৪০ দিন কর্মবিরতিও সেশন-জ্যামের অন্যতম কারণ"। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছাত্ররা তাদের ব্যাংক অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়। শিক্ষকরাও তাদের অধিকার ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। মাঝখানে একটু লাভ করে নিলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বন্ধ না করেও সম্পন্ন করে দিলো স্থগিত পরীক্ষসমূহ- যা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলে হতে পারতো কি না সন্দেহ করেছে অনেকেই।

কর্ম বিরতি পালন করে সন্ত্রাস দমন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ২৭ অক্টোবরের ঘটনার প্রতিবাদে যদি শিক্ষক সমিতি এ জাতীয় কোন কর্মসূচী হাতে না নিতো, তবে ঘটনার জের হিসেবে পরবর্তীদিন গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিস্থিতির যে আরো অবনতি হতো, তা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, কড়া পুলিশ নিরাপত্তায় পরীক্ষা চলাকালীন সময়েও খুচরা কতিপয় ঘটনা ঘটে যা থেকে মনে করার কোন কারণ ছিল না যে সন্ত্রাসীরা ২৭ অক্টোবর ঘটনার প্রেক্ষিতে শান্ত হয়ে গেছে। শিক্ষকদের কর্মবিরতিকে জায়েজ করার জন্য এ লেখাটি নয়। লেখাটির উদ্দেশ্য ছাত্রদের আচরণ বিষয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার দেখা গেছে কারণে-অকারণে ছাত্রকর্তৃক অনেক ধর্মঘট, এমনও দেখা গেছে, কোথায় চার-পাঁচজন ছাত্র নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, পরদিনই তার প্রতিবাদে কলাভবনে হরতাল। ঐ সকল হরতালের হিসাব হয়ত অনেকেই বিবেচনায় আনবেন না। খুচরা এ ধরনের হরতালের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্ররা একবার (৮৯ সালের আগস্ট মাসে) কলাভবন সংলগ্ন এলাকায় মিছিলও বের করেছিল।

শিক্ষকদের বেতন আটকে তাঁদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারে বাধ্য করানো নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সিদ্ধান্ত ছিলো না। হয়ত অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ ঘটনা এখনও জানে না। কিন্তু যে আচরণটি কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী করেছে তা অবশ্যই দুঃখজনক এবং সুস্থ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের পরিবেশ গড়ে ওঠার পরিপন্থী। হয়ত বা হঠাৎ করে অবিরাম কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা উচিত হয়নি, কিন্তু তার পরে কথা হলো সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবেই। যারা ব্যাংক অবরোধের কর্মসূচী নিয়েছিল তাদের অন্ততঃ উক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে তবে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। এই ধরনের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের যে অবমাননা করা হয় তা কর্মসূচী গ্রহণকারী-ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা উচিত ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য ছাত্রদের এহেন প্রোগ্রামের বিপক্ষে কোন প্রতিবাদ কেউ করেনি যে সমাজ ব্যবস্থায় সর্বত্র এখন বিরাজ করছে ঘুষ, দুর্নীতি, রাহাজানি, মাস্তানী, সেখানে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মনে করে কিছু কিছু শিক্ষক সন্ত্রাসীদেরকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। উক্ত ফলাফল থেকেও কি মনে হয় না সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শতকরা ৯৬ ভাগ শিক্ষকের কর্মবিরতি বৈধ না অবৈধ ছিল? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান, গবেষণা ইনস্টিটিউটের সন্ত্রাস সম্পর্কিত জরিপের ফলাফল থেকেও এটি প্রমাণিত হয়, রাজনীতি প্রিয় কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর এ হেন 'মাষ্টারদের না খাইয়ে মারার কর্মসূচীটি' কি পরিমাণ দায়িত্বহীনতার প্রোগ্রাম ছিল।

অবশ্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্রদের এ ধরনের কর্মসূচীর জন্য দায়ী শিক্ষকরা। কারণ শিক্ষকরা যা শিক্ষা দিচ্ছে তাঁদের প্রাণ-প্রিয় পুত্রতুল্য ছাত্রদেরকে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তাদের শিষ্যদের মধ্য দিয়ে। 'একতাই বল' - এ নীতিবাক্য তাঁরা একদিকে বিক্রি করছে ছাত্রদের কাছে, অন্যদিকে তাঁরাই আবার একতার নীতি ভঙ্গ করে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছে, তারাই শিক্ষা দিচ্ছে "সদা সত্য কথা বলবে", অপরদিকে তাঁরাই সত্যমিথ্যে যাচাই না করে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী কালিমা লেপন করে তাঁদের সম গোত্রীয়দের ওপর, শিক্ষা দেয় নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে, অথচ তাঁরাই দশ দিনের কাজ করে দশ মাসে। যার জন্যই মাঝে-মধ্যে দেখা যায় ছাত্রকর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত, বত্রিশ মাস ধরে জনৈক হাইস্কুল শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না; ফায়ার সার্ভিসের জনৈক কর্মকর্তা কর্তৃক স্কুল শিক্ষিকা অপহরণ এবং বিচারে দোষী প্রমাণিত হবার পরও বহাল তবিয়তে উক্ত কর্মকর্তা বহাল, এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত।

যা হোক, অবশেষে গুরু মারার কর্মসূচী ছাত্ররা তুলে নিল। ঝুট ঝামেলা ছাড়াই শিক্ষকরা বেতন তুলতে পারলেন। মাঝখানে কিছু তিক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠলো ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে। হয়ত একদিন ভুলে যাবে সকল পক্ষই এবং ভুলে যাওয়া উচিতও। যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন এবং ছাত্রদের অবরোধ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছিল তার কিন্তু কোন নিষ্পত্তি হলো না। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে যত লেখালেখি হয়েছে, বিগত কুড়ি বছরে অন্য যে কোন বিষয়ের ওপর এত লেখালেখি হয়নি। লেখালেখিতে যে কোন কর্ম হয় না, সন্ত্রাস বিষয়ক লেখাই তার প্রমাণ। বরং আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বিপরীত কথা বলেছেন। সরকার প্রধান বলেছেন, পুস্তক পড়ে ভাল কাজ সম্পাদন সম্ভব নহে। পুস্তক পড়ে শুধু সময় নষ্ট হয়, এ জন্যই বোধহয় ছাত্ররা এখন রাজনীতিপ্রিয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো বচন দেবার সময় ভুলে গিয়েছিলেন যে আল্লাহ্‌র বাণীও নাজেল হয়ে বর্তমানে পুস্তকারে সংরক্ষিত আছে। বিশ্বাসে আন্তরিকতার অভাব থাকলেই এ হেন বচন দেয়া সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কিন্তু সেই আন্তরিকতারই বহির্প্রকাশ দেখাতে চেয়েছিল তাঁদের কর্মবিরতির ভেতর দিয়ে, যে আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে তাঁরা গ্রীষ্মের বাহান্ন দিনের ছুটি এবং রমজান মাসের কুড়িদিনের ছুটি বাদ দিয়ে ক্লাস নিতে। সন্ত্রাস শিক্ষকরা করেন না। ছাত্রদের মতামত তার প্রমাণ। যে সকল রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতারা সন্ত্রাসকারীদের মদদ দেয়, দলে প্রশ্রয় দেয় এবং সর্বোপরি সন্ত্রাসীদের পৃষ্টপোষকতা করে, তাদেরকে বরং ঘেরাও করা উচিত, তাহলে বর্তমানে বিরাজমান সেশন-জ্যাম সমস্যা দুই বছরেই শেষ হয়ে যাবে; নইলে দুই হাজার বছরেও দূর হবে কিনা সন্দেহ।

হরিপদ ভট্টাচার্য : সহকারী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।